সংবাদ

তারিখ ... 2 2 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

স্কুলে যাবে পথশিশুরা পথে পথে ঘুরবে না

আব্দুল মান্নান খান

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অধিকার বঞ্চিত পথশিশুদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে তাৎক্ষণিক কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে। তাই এবার আশা করা যায় পথশিশুরা আর পথে পথে ঘুরবে না। এ যাবত ওদের নিয়ে বহুত কথা হয়েছে বহুত লেখালেখি হয়েছে। কত সাক্ষাৎকার কত সচিত্র প্রতিবেদনও আমরা দেখেছি। কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। এবার হবে আশা করতে পারি।

প্রতিদিন সকাল বেলা ৫-৭-১০ বছরের শিশুদের দলে দলে একেকটা সিমেন্টের পুরনো ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে এটা-সেটা টোকাতে দেখা যায়। এ দৃশ্য আমি মনে করি ঢাকা শহরের অনেকেই দেখে থাকবেন। দেখা যায় ওরা বেশির ভাগই খালি গায়ে খালি পায়ে ছুটছে– কার আগে কে এক টুকরা প্লাস্টিক বা একটু ধাতব খণ্ড খুঁজে পাবে এই প্রতিযোগিতায়। বেলা বাড়লে ওদের আর দেখা যায় না। ওরা তখন মিশে যায় মানুষের ভিড়ে। ওদের পাশ দিয়েই ওদের বয়সের শিশুরা স্কুলে যায়। অনেকে স্কুলের আশপাশ দিয়েই ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো ভয়ঙ্করও হয়ে উঠতে পারে ওরা। হেন অপকর্ম নেই যা ওরা করতে পারে না। সে অপকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খায়। কখনো জীবনও যায়। তবে একথা তো সবাই স্বীকার করবেন ওরা যেটা করে দুটো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যই করে। ওদের বাবারা খেতে-পরতে দেয়া তো দূরের কথা রীতিমতো মেরে ধরে তাড়িয়ে দেয়। ধারে কাছে ঘেষতে দেয় না। নিজে কিছু খাচ্ছে ৪-৫ বছরের শিশু সন্তানকে দিচ্ছে না বরং তাড়িয়ে দূর করে দিচ্ছে সামনে থেকে এমনও দেখা যায়। অবশেষে ওদের ঠিকানা হয় রাস্তায়। আর নাম হয় পথকলি কখনো পথশিশু-টোকাই নাম তো আছেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক পথশিশুর খাদ্য, আশ্রয় এবং শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন সেদিন। তিনি বলেছেন, কোন শিশু রাস্তায় জীবনযাপন করবে না। আমরা ১৬ কোটি লোকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। তাই প্রায় ৩৪ লাখ পথশিশুকে খাওয়ানোর সক্ষমতা সরকারের রয়েছে। তিনি বলেছেন, শিক্ষা যেন শিশুর জন্য বোঝা না হয় বরং স্কুলগুলোতে ও পরিবারে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে তারা নিজেরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে এবং পড়াশোনায় উৎসাহ বোধ করবে। প্রতিটি শিশুকে তাদের এলাকার স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শিশুরা যে এলাকায় বসবাস করে সেখানকার স্কুলগুলোতে সুযোগ পাওয়া তাদের অধিকার। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেছিলেন দেশ স্বাধীনের পর পরই। তখন অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে এমন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা কেবল বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। আর এখন তো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো এবং তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ একটা ভালো সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। দেশ এখন আর সেই তলাবিহীন ঝুড়িও নেই সেই নিম্ন আয়ের দেশও নেই। এখন কেন আমাদের শিশুরা পথকলি পথশিশু এসব নাম নিয়ে পথে পথে ঘুরবে আর পথেই ঘুমাবে– তা হয় না। তারা আর স্বাভাবিক জীবনের বাইরে থাকতে পারে না।

এখানে ৩৪ লাখ সংখ্যাটি দেখে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। সংখ্যা তত্ত্বের দিকে না তাকানোই ভালো। প্রয়োজন কাজটা শুরু করা। শুনতে খারাপ লাগলেও বলতে হয় প্রয়োজনে ওদের জোর করে ধরে এনে এক জায়গায় আটকাতে হবে। খুঁজে দেখতে হবে বাপ-মা কাউকে পাওয়া যায় কি-না। পাওয়া গেলে যদি দেখা যায় ওই শিশু পথে পথে ঘুরে কোন না কোনভাবে কিছু যোগাড় করে তার বাবা-মাকে দিত তাহলে সেটা তাদের পুষিয়ে দিতে হবে।

ওদের জন্য ছোটখাটো জায়গায় হবে না। বলা যায় বিকেএসপির মতো একটা জায়গার প্রয়োজন হবে। ভাই বলে সেটা ঠিক করতে গিয়ে যেন দীর্ঘসূত্রতায় পড়ে সব ভণ্ডুল হয়ে না যায় এ জন্য প্রয়োজনে এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা নিয়ে ভাড়ার বাড়িতেই কাজটা শুরু করে দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা এবং নির্দেশ মোতাবেক আমরা আশা করব কাজটা এ বছরই শুরু হবে। শুরু হলেই না একদিন তা বিস্তার লাভ করবে। তার ফল পাওয়া যাবে।

একটা কথা বলে রাখি, নদী-খালের অনেক জায়গা দখল হয়ে আছে ঢাকাতে। কোথাও মাটি ফেলে ভরাট করে রাখা হয়েছে কোথাও আবার ছোট-বড় স্থাপনা খাড়া করে রেখেছে দখলবাজরা। সেগুলো দখলমুক্ত করে ওদের জন্য লম্বা টিনশেড তৈরি করে দেয়া যেতে পারে যদিও কাজটা করা বড়ই কঠিন কিন্তু আমি মনে করি মোটেই অসম্ভব না।

ওইদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষা যেন শিশুর জন্য বোঝা না হয়। দেশের শিশুরা লেখাপড়ার বোঝার নিচে অর্থাৎ চাপের মধ্যে পড়েছে বা ওদের চাপের মধ্যে ফেলা হয়েছে একথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জানা আছে। শিশুদের প্রতি সে চাপটা কেমন তা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আমিও সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলার চেষ্টা করে আসছি বেশ কিছুদিন থেকে। যেমন শিশুরা কেন নোট-গাইড পড়বে– গলদটা কোথায়? তাহলে কি শ্রেণীকক্ষে সহজ জিনিসটাকে বুঝে বা না বুঝে কঠিনভাবে পাঠদান করা হচ্ছে –নাকি যেটা পড়ান হচ্ছে সেটা ওই শ্রেণীর শিশুদের জন্য আসলেই কঠিন হয়ে গেছে নাকি কঠিনভাবে প্রশ্ন করে শিশুদের ঘাবড়ে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা কঠিনের মধ্যে পড়ে ঘাবড়ে গিয়েই তো নোট-গাইড কিনতে এবং কোচিং করতে বাধ্য হচ্ছে। না হলে কেন তারা নোট-গাইডের পিছনে ছুটবে। এটাই তো শিশুদের প্রতি চাপ এটাই তো ওদের বোঝা। আমি প্রাইমারির শিশুদের কথা বলছি। ৩য় শ্রেণীতে ইংরেজির বহর দেখলে রীতিমতো চমকে উঠতে হয়। আবার এ শ্রেণীর একটা শিশুকে ধর্মের কি-না শেখান হয় যেন জীবনের মতো ধর্ম শিখে নিচ্ছে তারা আর কখনো কিছু শেখার প্রয়োজন হবে না। এ নিয়ে আগে এ কলামে ৩য় শ্রেণীর ইংরেজির একখানা প্রশ্নপত্র তুলে ধরে বিস্তারিত লিখেছিলাম। বলেছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর ৮-৯ বছর বয়সের কোমলমতি একটা শিশুর পক্ষে ইংরেজির এই সুদীর্ঘ প্রশ্নপত্র পড়ে-বুঝে দুই ঘণ্টায় উত্তর করা কিভাবে সম্ভব! আর যদি সম্ভব হয়ও তাহলে সেটা কত পার্সেন্ট শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব। এমন লেখাপড়া করার মতো সুযোগ-সুবিধাই বা আমাদের কতজন ছেলেমেয়েরা পেয়ে থাকে।

সে যাহোক, আমি মনে করি এ বোঝা বা চাপ দূর করতে হলে, এমন বই তথা কারিকুলাম অবশ্যই তৈরি করতে হবে এমন পাঠদান পদ্ধতি অবশ্যই ঠিক করতে হবে এমন প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা পদ্ধতি অবশ্যই বার করতে হবে যাতে কেউ আর নোট-গাইডের কথা ভাবতে না পারে। প্রশ্নপত্র যদি পাঠদানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয় এবং সেটা নিজ নিজ স্কুলের শিক্ষকরাই করেন এবং ক্লাসের সব ধরনের ছাত্রছাত্রীর কথা মাথায় রেখে পড়ান এবং প্রশ্নপত্র তৈরি করেন তাহলে এসব কোমলমতি শিশুদের বিচলিত হওয়ার মতো কোন কারণ থাকে না। নোট-গাইড আর কোচিংয়ের পিছনেও ছুটতে হয় না। সুতরাং আমি বলতে চেয়েছি সব কিছু মিলে পদ্ধতিটা হতে হবে এমন যে লেখাপড়া করতে শিশুদের নোট-গাইড না লাগে কোচিং করা না লাগে নকল করার প্রয়োজন না হয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রয়োজনীয়তাও না পড়ে। এর জন্য কাজ করতে হবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, এনসিটিবিকে। প্রাইমারি পর্যায়ের পাঠ্য বই তথা কারিকুলাম তৈরির দায়িত্ব তাদের। প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণা এবং শ্রেণীকক্ষ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেয়া। সে যেমন করেই হোক আর যেই করুন শিশুদের জন্য এমন একটা কারিকুলাম তৈরি করা জরুরি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিন বলেছেন, শিশুরা যে এলাকায় বসবাস করে সেখানকার স্কুলগুলোতে সুযোগ পাওয়া তাদের অধিকার। প্রতিটি শিশুকে তাদের এলাকার স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন নিশ্চিত বলা যায় এ নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে যাবে। ছোট সোনামনিদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটা যে কি ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে দেশে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভুক্তভোগীরাই না সেটা টের পান। ১ম বা ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হতে শহরের বিশেষ করে ঢাকা শহরের শিশুদের যে মহাযজ্ঞের মুখোমুখি হতে হয় তাতে ওরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিছু বলতে পারে না ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ে। শৈশবের যে আনন্দ তা আর থাকে না।

উদাহরণ হিসেবে একটি পরিবারের কথা বলি, তাদের দুটো সন্তান। শুরু থেকেই তারা সন্তান দুটোকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তুলতে চান। তাই একটু দূরে দূরে রেখে তাদের বড় করে তুলছেন। দূরে দূরে বলতে কোলেপিঠে করে আদর-সোহাগ তারা করেন না। কাছে শুইয়ে গল্প-ছড়া কবিতা তারা শুনান না। কারণ ক্যাডেট কলেজে মা-বাবা ছেড়ে থাকতে হবে। তারজন্য আগেই সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে। এতে বাসায় এমন পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেছেন যে, কোন মেহমান-আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত ওই বাসায় যাওয়া বন্ধ। মেহমানদের আনাগোনা থাকলে লেখাপড়ার ব্যাঘাত হতে পারে তাই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খরচ করতে তারা উদার হস্ত। ইন্টারভিউ নিয়ে সবদিক যাচাই-বাছাই করে দেখে তারপর তারা গৃহ শিক্ষক নিয়োগ দেন। কোচিং-এ পাঠান না। শিক্ষক সাহেবরা বাসায় আসেন পালাক্রমে।

শিশুরা যে কোল চায় আদর চায় সেদিকে গুরুত্ব দেন না তারা। এমনকি পড়ে গেলেও ধরে তোলেন না অভ্যাস খারাপ হবে বলে। বরং বলেন, ধরার দরকার নেই নিজে নিজে উঠুক। এ রকম মনোভাব নিয়েই অনেক মানুষ শিশুদের সাথে এমন আচরণ করে থাকেন। এখানে ভালো লক্ষণীয় একটা বিষয় যে, এ মনোভাবটা তারা শিশুদের পড়ালেখার ব্যাপারে একেবারেই পোষণ করেন না। একটা শিশু যে নিজে নিজেও অনেক কিছু শিখে নিতে পারে– এ ধারণা তারা করতেই পারেন না। ফলে শিশুদের ভেতর নিজে পড়ার যে আনন্দ সেটা সৃষ্টি হয় না।

আবার শুধু যে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির জন্য এ অবস্থা তা না। সারা দেশে যত নামিদামি স্কুল আছে সব জায়গায় এই একই অবস্থা। ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে হবে, ওই স্কুলে পড়তে হবে এর জন্য অভিভাবকেরা অনেক সময় এমন কি সন্তানদের আদর করার মনোভাবটা হারিয়ে ফেলেন। ভর্তি প্রতিযোগিতায় যে কোন উপায়ে টিকতে হবে। অমুক পারলে তুমি কেন পারবে না– অভিভাবকের এমন কথায় তাদের শুনতে হয় বারবার। অভিভাবকেরাও এ অবস্থায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ বাসার কাছের স্কুলটাতে সন্তানকে ভর্তি করতে চাইলে বিনা পরীক্ষায় তারা খুশি হয়ে ভর্তি করে নেবেন এমনও দেখা যায়। এমনটা হলে ছেলেমেয়েরাও মনের আনন্দে স্কুলে যাতায়াত করতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় পড়ে থাকতে হয় না। ওই সময়টা তারা খেলাধুলা করে কাটাতে পারে। কিন্তু অভিভাবকরা সে পথে হাঁটতে পারছেন না নানা কারণে।

শিশুরা হেঁটে স্কুলে যাতায়াত করতে পারে এমন দূরত্বের মধ্যে যে স্কুল থাকবে সে স্কুলেই তাদের ভর্তি করতে হবে এটা যদি চালু করা যায় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার যে আমূল পরিবর্তন আসবে তাতে সন্দেহ নেই। এর জন্য বড় শহরে বিশেষ করে ঢাকা শহরে যে যেখানে বসবাস করবেন তার সন্তান সেখানকার স্কুলে পড়াতে হবে। হেটে যাওয়া যায় এমন দূরত্বের মধ্যে রেখে তাদের লেখাপড়া করাতে হবে সে যেমন স্কুলই হোক। এমনভাবে স্কুল না থাকলে স্কুল হয়ে যাবে। এটা করা গেলে খারাপ(?) স্কুলও ভালো হতে সময় লাগবে না। কোনো স্কুল খারাপ না কোনো শিক্ষক খারাপ না এ শ্লোগান সামনে নিয়ে এ কাজে এগিয়ে যেতে হবে– একথা আগেও বলেছি এক লেখায়। তারপরও ভালো স্কুল মনে করে কেউ তার সন্তানকে কোন স্কুলে পড়াতে চান তবে তাকে ওই স্কুলের ধারেকাছে গিয়ে বসবাস করতে হবে। এতে যদি কোন একটা এলাকা ব্যয় বহুল হয়ে ওঠে, বাসা ভাড়া বেড়ে যায় জমির দাম বেড়ে যায় জায়গাটা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তাতে অসুবিধা কী? যার সামর্থ্য আছে সে তার সন্তানের লেখাপড়ার জন্য বেশি টাকা খরচ করবেন তাতে কার কী বলার থাকতে পারে। কিন্তু তাকে ওই ব্যয় বহুল স্কুলের কাছে গিয়ে বসবাস করতে হবে অথবা সে এলাকায় সন্তানকে রেখে লেখাপড়া করাতে হবে। এতে কোন কোন জায়গা ভালো লেখাপড়ার মডেল হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে।

যাহোক শেষ করব এ আশা নিয়েই, কোন শিশু আর পথে পথে ঘুরবে না কোন শিশু আর রাস্তায় ঘুমাবে না। কোন শিশুকে আর পরীক্ষায় পাস করতে না পারার ভয়ে নোট-গাইডের পিছনে ছুটতে হবে না কোচিং করতে হবে না। কোন শিশুকে আর জীবনের শুরুতে স্কুলে ভর্তি হতে এখনকার মতো পরীক্ষা দিতে হবে না। পরীক্ষা যদি শিশুদের মেধা যাচাইয়ের জন্য নেয়া হয় তবে তার রাস্তা অবশ্যই পাওয়া যাবে।